বাংলাদেশের উর্দু সাহিত্য

আসাদ চৌধুরী

ঐতিহ্য

সূচি

নিবেদিত কবিতা

অরণ্যেও বৃক্ষ একা থাকে ০৯
প্রিয় কবি, প্রিয় বান্ধব ১০

বাংলাদেশের উর্দু কবি ও কবিতা

আতা আসফি ১৩
আতাউর রহমান জামিল ১৩
আতিফ বানারসী ১৬
আদিব সোহেল ১৭
আন্দালিব শাদানী ২০
আনোয়ার জেবী ২২
আবদুল হামিদ সাকী ২২
আবিদ জৈনপুরী ২৪
আবিদ দানাপুরী ২৫
আসগর রাহী ২৬
আসিফ বানারসী ২৭
আহমেদ ইলিয়াস ২৮
আহমদ সাদী ৩২
আহসান আহমদ আশ্‌ক্ ৪১
ইকবাল রশিদী ৫৩
ইসমাইল হিলালী ৫৪
ইয়াবর আমান ৫৭
এরশাদ আহমদ এরশাদ ৬০
ওয়ালিউল হামিদ আজিজ ৬০
কামিল কলকাতভী ৬২
কালীম সাসারামী ৬৩
কাসেম আনিস ৬৩
কুদ্দুস সিদ্দিকী ৬৪
খলিলুর রহমান জখমী ৬৬

জহুরুল মোবারকী ৭১
জামাল মাশরেকী ৭২
জালাল আজিমাবাদী ৭৩
জুবায়ের ইরতাজা ৭৪
তারেক বানারসী ৭৫
নঈম আহমদ নঈম ৭৬
নওশাদ নূরী ৭৭
নিয়াজ আহমদ নিয়াজ ৮৪
নূর খান নূর ৮৫
মাহবুব শায়দায়ী ৮৬
মাহের ফরিদি ৮৮
মেরাজুল আরেফি ৮৯
মোহাম্মদ জাকের হোসেন ৯১
মোহাম্মদ মতিউর রহমান নিজামী তানহা ৯২
রেজা আলী ওয়াহশত ৯৩
শাম্‌স্‌ শায়দায়ী ৯৫
শামীম জামানভী ৯৬
শিরিন কারিশমা ১০১
সাবির আলী সাবির ১০১
সালিমুল্লাহ ফাহমী ১০২
সিন নুন ফাহমী ১০৪
সৈয়দা ফাতেমা ইসলাম রোজি ১০৬
সৈয়দা শামীম ১০৭
হাফেজ দেহেলভী ১০৯

স্মৃতি-আলাপন
কবি নওশাদ নূরীকে নিয়ে আসাদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ১১৩

পরিশিষ্ট
গজল সম্পর্কে বাতচিত ১৪১
আমার বন্ধু আহমেদ ইলিয়াস ১৪৪

অরণ্যেও বৃক্ষ একা থাকে

কবি আহসান আহমদ আশ্‌ক্ শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরণ্যেও বৃক্ষ একা থাকে
ভিড়ের মধ্যে যেমন আমি, তুমি
চুল পেকেছে কয়েক বছর আগে
স্বদেশ তবু হয় না জন্মভূমি;

দোলনা দোলে, কুয়ার পাশে মাতা
ব্যস্ত ভীষণ রাজ্যির কাজ হাতে
মকাই ক্ষেতে রইল পড়ে বাঁশি–
মালিদাও পাল্টে গ্যালো ভাতে ।

এই শহরের অলিগলি জানা
হরেক পেশার শ্রম দিয়েছি মেলা
দেখতে-দেখতে ঘনিয়ে এল বেলা
আর কত দিন পরবাসীর খেলা ।
স্বদেশ আমার গেঞ্জি? না কি রুমাল?
যখন যেমন পাল্টে নিলেই ভালো?
তিন পতাকার নিচের আঁধার হয়ে
স্বপ্নস্মৃতির সাঁকোয় ঢালি আলো ।

স্বদেশ আমার স্মৃতির তোড়া?
না কি বাস্তবতার ঘানি কেবল টানা
দেশপ্রেমে আকুল কাঁপতে থাকি
অবিশ্বাসীর দৃষ্টি-বৃষ্টি হানা ।
নাতির জামা শুকোয় ছাদের ওপর
গালিব-মীরের পঙ্‌ক্তিগুলো মলিন–
বাসের ভিতর লতা-রফির আওয়াজ
ধনীর বাসা বম্বে-ফিল্মে বিলীন ।
সৈয়দপুরের চিঠি আসে ডাকে
শব্দগুলো আধেক উর্দু-বাংলা,
আলো টোকা পড়ছে দ্রুত তালে
কিন্তু কোথায়? খিড়কি না কি জানলায়?

প্রিয় কবি, প্রিয় বান্ধব

নওশাদ নূরীকে

যিনি ভাষা-আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে
যিনি ছয় দফার অনুবাদক,
‘তেরে নাজাত, মেরে নাজাত
ছানুকাত, ছানুকাত’
যিনি ’৭১-এর মার্চে বাংলাদেশের পক্ষে কবিতা লিখে
নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন

যাঁর ঘরের দেওয়ালে ছিল
জাতীয় কবিতা পরিষদের উজ্জ্বল পোস্টার–
যাঁকে আমরা কিছুই দিতে পারিনি
তাঁর অম্লান স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ।

আতা আসফি

গজল

এটা তো জানাই, বিনা কারণে কুশল কেউ শুধায় না,
যেভাবে, যেখানে ছিলাম, ভালোই ছিলাম, সুখেই ছিলাম ॥
ভালোই ছিলাম, বসন্তের মর্জির ভিতর,
রূপসিদের আঙিনার চারদিকে মেলা ঘুর-ঘুর করেছিলাম ॥
মিলন-সন্ধ্যার নিবিড় কেশরাজির ছায়া উজ্জ্বল কপালে,
দিবালোকের ঝিকিমিকির মতোই তোমার গালের আলোর দীপ্তি ॥
পানপাত্র ঘুরে-ঘুরে চলছে, মধুর নৃত্য-গীতি,
মন চায়, সন্ধ্যা থেকে সকালতক সুধাকণ্ঠীরা গজল গাক ॥
সুন্দরীর গান আমার হৃদয় বিহ্বল করে ফেলেছে,
হে আতা, তবে কি সে চায় আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বলতেই থাকুক ॥

পরিচিতি : আতা আসফি

মোহাম্মদ মতিউর রহমান সাহেবের দুই ছেলেই কবিতা লিখতেন– কুদ্দুস সিদ্দিকী এবং আতা আসফি। বেশ কয়েকটি মুশায়রায় তাদের কাব্যপাঠ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দুর্ভাগ্য, এখন পর্যন্ত তাদের কোনো বই বেরোয়নি। আতা আসফির আদি নাম মোহাম্মদ আতাউর রহমান, জন্ম কলকাতায়, ১৯২১ সালে। বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলেন।

রেজা আলী ওয়াহ্শতের শাগরেদ মওলানা শাকের কলকাতাভীর শাগরেদ ছিলেন আতা আসফি। পরে আতা আসফি আসিফ বানারসীর শাগরেদ হন।

আতা আসফি ঢাকায় শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যু : ২৯ নভেম্বর, ১৯৮৬।

আতাউর রহমান জামিল

হাত

এ সেই হাত যে শরীরে যতটুকু রহস্য
সে-রহস্যটুকু জানে—
ভাগ্যের নামে যে-লেখা গোপনে রয়েছে
কোনো কোনো সময় দেরিতে বোঝে এই হাত,
কোনো কোনো সময় কাছে থাকলে বোঝে
কখনো বা চোখের আড়ালে থাকলেও বুঝে নেয়;
হাতই ভিখিরি
রাস্তায়-রাস্তায় এই হাত ছড়ানো-ছিটানো
পাথর এবং লোহায় যে-হাত ডুবে আছে
আমি যে তার কোনো নাম দিতে পারলাম না ।
ঐ অন্ধকারে যে ঐ হাতটি ঠিকই চিনতে পারবে
তার চোখের ঐশ্বর্য কায়েম থাকুক ।

অশেষ যাত্রা

বন্ধ দরোজা দিয়ে কেউ আসতে পারে না,
না তিল, না চেহারা, না চুল, না লাজলজ্জা
কিছুই না ।
রাতের চোখ থেকে
টুপ-টুপ করে ঝরে-পড়া অশ্রু হলো তারা—
চাঁদ : রাতের কালো আঁচলের একটা দাগ মাত্র
যখন বন্ধ হয়ে যায় চোখের জাদুঘর
কে জানে কালো সূর্য কোথায় উদিত হবে ।

পরিচিতি : আতাউর রহমান জামিল

কবি আতাউর রহমান জামিল-এর পিতৃদত্ত নাম আতাউর রহমান মোহাম্মদ জামিল। জন্ম ভারতের পাটনার বিহার শরীফে, ২২ জুন, ১৯২৯। ১৯৪৮ সালে ঢাকা চলে আসেন, ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বছরেই সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে। ১৯৬০ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৯৭২ সালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার), ১৯৮৪ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৯৮৫ সালে প্রকৌশলীর পদে উন্নীত হন। ১৯৮৭ সালে সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসর নিলেও বসে থাকেননি। স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত সংগঠনসমূহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় ছিল। ঢাকার হালকা-ই আরবার-ই জৌক-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (ঢাকা)-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। চট্টগ্রামের সাহিত্য সংস্কৃতি সংঘের সহ-সভাপতি। ঢাকার আঞ্জুমান-ই তরক্কিয়ে উর্দুর সদস্য। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সদস্য, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সদস্য; এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা গেলেও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন, শুধু নামকাওয়াস্তে নয়।

বেশ কয়েকটি ভাষা তিনি জানেন— ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, বাংলা এবং হিন্দি। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিন ছেলে এক মেয়ের গর্বিত পিতা। সন্তানেরা সবাই সুশিক্ষিত এবং কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মপ্রাণ এই উদার কবি শ্যামলীতে অবস্থিত নিজের বাসায় অবসর জীবনযাপন করছেন।

আতাউর রহমান জামিলের সঙ্গে শুধু মুশয়েরায় দেখা হয়েছে আমার। শান্ত, সৌম্য ও শরিফ এই মানুষটিকে দেখলে সম্ভ্রম হয়। তবে, যেন একটু লুকিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন, নিজেকে সামান্যতম জাহির করার প্রয়োজন থাকলেও নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। প্রখ্যাত উর্দু-কবি নওশাদ নূরী ও আহমেদ ইলিয়াসকে দেখেছি জামিল সাহেবকে তারা যথেষ্ট সমীহ করেন এবং অবশ্যই উলটোটিও।

বাংলা সত্যি ভালো জানেন, তাঁর সঙ্গে কথা বললে বোঝার উপায় থাকে না যে, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। মাঝখানে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, আবার দেশের ছেলে দেশেই ফিরে এসেছেন।

আমার আরেক কবি-বন্ধু ছিলেন জামাল মাশরেকি (আহা, তিনি আজ বেঁচে নেই), একটি পত্রিকা বের করতেন, নিয়মিত উর্দু পত্রিকার কথা ভাবাই যায় না, অবশ্যই অনিয়মিত, বিভিন্ন সময়ে তাঁর কল্যাণে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো। এস.এম. সাজিদ সম্পাদিত শাহকারের প্রকাশনা উৎসব কি মুশায়েরায় (কাব্য-পাঠের আসর) দেখা হতো।

না, এ পর্যন্ত তাঁর কোনো বই বেরোয়নি, যদিও পাকিস্তান ও ভারতের নামি সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা, আগেই বলেছি, বেশ প্রকাশিত হয়েছে।

আতিফ বানারসী

গজল

বিশ্বাসে আস্থা হোক অচঞ্চল, যদিও
এই দুনিয়া অবিশ্বাসে ডুবে আছে।
দুর্ভাবনার বোঝা মেনে নিয়ে
দুঃখীজনের মাঝে বিলাও প্রেম।

নক্ষত্ররাজি বলছে, ঠিকানা-সম্পর্কে নিশ্চিত থেকো,
আরো একটু সবুর করো, আরো খানিক অপেক্ষা করো।

সূর্য বানিয়ে নাও মৃত্তিকার কনিকাকেই
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে তোমার পথ করে নাও।

মালঞ্চ যে বড় উজ্জ্বল আর রঙিন,
সেতো কচি-কচি কলির শোনিতেই,
নৈঃশব্দ্যের ছন্দে-তালে বসন্তকে সম্ভোগ করো।

আতিফ, তোমার মুখে এখনও তো রক্তের ছোপ-ছোপ দাগ
জীবনের দিগন্ত রাঙাতে চাইলে, এখুনি রাঙিয়ে নাও ॥

পরিচিতি : আতিফ বানারসী

আসল নাম মোহাম্মদ জসীমউল্লাহ, পিতার নাম আমীর আলী। হাফেজ দেহেলভীর শাগরেদ। জন্মস্থান ও তারিখ ১৯৩২, বানারস (ভারত)। ১৯৫১-তে ভারত থেকে এদেশে চলে আসেন। বানারসের গভর্নমেন্ট কুইন্স কলেজ-এ ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন।

রেলওয়েতে চাকরি করতেন। যশোরের নিউটাউনে নিজের বাড়িতে অবসর জীবনযাপন করছেন।

আদিব সোহেল

মোহাজের এবং আনসার

লক্ষ লক্ষ মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি, শিশু হজরতে এসেছো,
তোমাদের সীমাহীন আত্মপ্রেম, মনে রেখো বিষের মতোই।
কোনো ভাষাই পর নয়, প্রতিপক্ষ নয়, সব ভাষাই মাতৃভাষা,
প্রতিবেশী হয়েও যে অপরের ভাষার কদর বোঝে না
সে তো নিজের ভাষারও বন্ধু নয়।
হিজরত করতে এসে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবী,
মনে রেখো, সীমাহীন আত্মপ্রেম বিষের মতোই।

সকলেই নয়, তোমাদের মধ্যে কিছু লোকের কাছে
এই মাটির সুঘ্রাণ এখনো অচেনা।
এই মাটি থেকে তরঙ্গের উত্তাল নৃত্য শুরু হলে
পথের মধ্যে পাথর হয়ে বাধা দিলে এই আন্দোলন,
না-হয় আন্দোলন থেকে দূরে থেকেই
সৈকতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলে,
আশ্রয় নিলে গুজবের গহিন জঙ্গলে।
কল্পিত নতুন-নতুন বালা-মুসিবতের বেড়াজালে আটকে গিয়ে
ভয় পেলে, বিচলিত হলে।
নীড়ের শাখা ছেড়ে দিয়ে এবার ওড়ার কথা ভাবো,
ত্যাগের আর এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলে
বুকের বোঝা হালকা করতে চাইলে।
হিজরত করতে আসা অগণিত মানব-মানবী,
মনে রেখো, বিষের মতোই সীমাহীন আত্মপ্রেম।

ঘরবাড়ি ছেড়ে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে এ-রকম ভেবো না,
সমস্যার কোনো অন্ত নেই—
সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মতো
তুমি তামাশা দেখো না,
মাটির সুগন্ধের সাথে আত্মীয়তা গড়ে তোলো

তরঙ্গের সংগীত তুমিও অনুভব করতে থাকো ।
ঢেউয়ের সাথে-সাথে তুমিও আন্দোলিত হও,
নদীর গর্জনের জবাব দাও, 'এই তো আমি এসেছি, আমি হাজির ।'

নদনদীর ঘন বুনোটের দেশের বাসিন্দারা
ফলে-ফুলে ভরা খেত আর তার কৃষকগণ
আর তোমাদের বুদ্ধিজীবীগণ বেঁচে থাকুন ।
লালনের বাণী অমর হোক ।
চিরকাল তোমরা পরকে আপন করেছো,
এগিয়ে এসে বুকে লাগিয়েছো বুক
এটাই তোমাদের ইতিহাস,
খান জাহান আলী, আশরাফ তাউয়ামা, বলখী আর আলী বোগদাদী
যিনিই একবার পা রেখেছেন এই মৃত্তিকায়
তিনি হয়ে উঠলেন আত্মীয়ের অধিক, হলেন আপনজন,
তাঁদেরও ঠিকানা এই দেশ ।

নদীর মতোই প্রশস্ত তোমার হৃদয়
বহিরাগতরাও এই স্রোতস্বিনীরই এক-একটি বিন্দু,
যে জলবিন্দু নদী থেকে বিচ্ছিন্ন তার কীই বা মূল্য কীই বা মর্যাদা ।
স্বতন্ত্র বিন্দু নিস্তেজ, দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে ।
এসব অনেকেই বোঝেন, মানেন,
কিছু লোক তো আছেই, যারা নদী আর জলবিন্দুর কী সম্পর্ক
এখনো বুঝে উঠতে পারেনি ।
একদিন এই সত্য তারা বুঝবে,
ধীরে-ধীরে বুঝবে ।
গাঙের দেশের দিলদরিয়া মানব-মানবী
হৃদয়ের কপাট-দরজা খোলা রাখো,
তোমার শ্রেষ্ঠত্বের, মহত্ত্বের গোপন রহস্য তো এখানেই লুকিয়ে আছে ।
তোমাদের উদার ভালোবাসার স্বীকৃতিও এখানেই ।
এটাই তোমার অমর অহংকার
এটাই তোমার আদিম আদর্শ
যেকোনো মূল্যে এই আদর্শের পতাকা
আরও ওপরে তুলে ধরো ।

পরিচিতি ; আদিব সোহেল

আদিব সোহেল-এর পিতৃদত্ত নাম সৈয়দ মোহাম্মদ জহুরুল হক। রেলওয়েতে কাজ করেছেন, নয়াদিল্লি, কলকাতা, সৈয়দপুর, ঢাকা, ইসলামাবাদ ও করাচি চাকরির সুবাদে এসব শহর-নগরে ছিলেন। ১৯৪৭-এ কলকাতা থেকে সরাসরি সৈয়দপুর, ১৯৭৪ সনে ঢাকা থেকে ইসলামাবাদ।

ঢাকার উর্দু দৈনিক পাসবানের সঙ্গে এবং পাকিস্তানের মাসিকপত্র আফকার-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আঞ্জুমান-এ-তরক্কীয়ে উর্দু করাচি, (সিন্ধ)-র মাসিকপত্র 'কওমী জবান'-এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত।

মোহাজের-এর অনুবাদ শরণার্থী না-করে মোহাজেরই রেখে দিলাম। আনসার বলতে হয়তো কেউ কেউ বাংলাদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আনসার বাহিনীর সদস্যকেই বুঝবেন। মদিনা মুনাওয়ারার সেই ত্যাগী সাহাবাগণের কনোটেশন নিয়ে যে-আশা নিয়ে এই পদ্যটি লেখা হয়েছিল সে সময়ের মানুষকে কতটা বোঝাতে সক্ষম, বলতে পারি না।

প্রগতিশীল রাজনীতিতে আস্থাবান এই মোহাজের বর্তমানে করাচিতে বসবাস করছেন। জানি না, তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় লালনের জায়গা হয়তো করে নিয়েছে মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা, কিংবা লতিফ ভিটাইও হতে পারেন।

এই কবিতাটি একটি দলিল বলেই আমার মনে হয়েছিল।

জন্ম ভারতের বিহার রাজ্যের মুঙ্গেরের ছাওড়াহ্-তে, ১৯২৭-এর ২৬ জুন।

আন্দালিব শাদানী

গজল

আবির্ভাবে কিছু ঘটেছে বিলম্ব ধন্যবাদ, তবু এসেছো তো,
যদিও আশা ছিল আসবে তুমি ঠিকই, খটকা, দ্বিধা ছিল তবু ॥
লালিমা, রামধনু, পূর্ণমাসী চাঁদ, মায়াবী মেঘমালা, তারকা, সংগীত বিজলি, ফুল
সুন্দরী, তোমার কোঁচড়ে কী না আছে, দিয়েছো সে কোঁচড় আমার হাতে ॥
প্রেমের বিনিময়ে বিক্রি করি আমি নিজের মর্জি ও ইচ্ছাখানি,
খরিদ্দার যদি পাই এ-হৃদয়ের, আমাকে যদি কেউ আপন করে নেয় ॥
সামনে নেই কেউ, অধরে কেন তবে এঁকেছো প্রণয়ের হাস্যরেখা
অজানা কোনো লোক ধোঁকার ফেরে বুঝি পড়লো এইবার ॥
গুজব নয় মোটে, এসব ঘটে গেছে আমার ওপরেই,
প্রেমের অগ্নিতে যে শিখা জ্বলে ওঠে, পুষ্প হয়ে ঝরে সর্বদাই ॥
শোনাও কেন তবে, মিথ্যা প্রবচন, পুনরাবৃত্তিতে বাঁধা যে ইতিহাস,
আমার যৌবনের স্বপ্ন থেকে তুমি একটি কণা পারো ফিরিয়ে দিতে?
অপারগতা আর বোকামি, বন্ধুরা, ফারাক কিছু করো
হারালে একফালি হৃদয় টুটাফাটা মানুষ কী বা আর
করতে পারে !

পরিচিতি : আন্দালিব শাদানী

আন্দালিব শাদানী নামকরা কবি ও শিক্ষাবিদ। পিতৃদত্ত নাম ওয়াজাহাত হোসাইন। ভারতের উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদের সম্বল-এ ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি প্রথমে মাদ্রাসার পাঠ সমাপ্ত করেন, কৃতিত্বের সাথে। পরে উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিএ অনার্স এম. এ পাশ করেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, অবশ্যই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন, ১৯৬৯-এ, তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। প্রাচ্য দেশের সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারের ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে বিলেত থেকে ফেরেন।

জগজিৎ সিং যে-গজলটিকে আরো খ্যাতি এনে দিয়েছেন, সেই গজল অনুবাদ করতে গিয়ে ঘাম ছুটে গেছে আমার। জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনের কবিতার বেলায় এ-রকমটি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো আর সাধ করে বলেননি, সহজ কথা যায় না বলা সহজে।

ঢাকার নীলক্ষেতের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলো ধরনের সুন্দর একটি কোয়ার্টারে থাকতেন। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তিনি, নিশাতের পিতা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। সমালোচক হিসেবে নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিলেন এমন নালিশ বাজারে চালু আছে। তবু, ঢাকা-পাগল এমন আরেকটি লোকের নাম করলে আমি এর পরেই প্রফেসর মুনতাসির মামুনের নামই করব।

'ঢাকা সম্পর্কে জানতে চেয়েছো, কী বলি, তুমি কি চাও সমুদ্রের পানি আমি একটি চামিচে করে পাঠাই।'

ব্যক্তিগত চিঠিতে নিষ্ঠুর ও নির্মম সমালোচকের এই দুর্বলতা আমাকে আজও রীতিমতো কাবু ও মাজুল করে তোলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উম্মে কুলসুম আবুল বাশার ড. শাদানীর ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। এই ঢাকা-প্রেমিকের প্রতি, যথার্থ কবির প্রতি আমাদের ক্ষমাহীন অবহেলা ও অমনোযোগের কথাটিই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই।

আনোয়ার জেবী

গজল

যে-নকশা আঁকা আছে কপালের ওপর
ইতিবাচকতায় তার সাড়া পাওয়া যায় না, জ্বলে ওঠে অনস্তিত্বে ॥
যদি স্মরণ করো আমাকে, এটা হবে অর্থহীন,
আমাকে দেখেছো? ভেবে দ্যাখো তো, কোথায় দেখেছো ॥
আমি তোমার কবরীর কুসুম তোমার বড় আদরের
আমি পূর্ণিমার চাঁদ, তোমার জমিনের অনেক ওপরের আসমানে ॥
আল্লাহর বান্দাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখবে না,
ভালোবাসাকে তুমি ঘৃণা দিয়ে প্রচার কোরো না ॥
জেবীর এই আবাস, এক আল্লাহ-প্রেমিকেরই আবাস—
এই ঘরে যারা বাস করে, তাদের ওপর হোক আল্লাহর রহমত ॥

পরিচিতি : আনোয়ার জেবী

আনোয়ার জেবী বর্তমানে চট্টগ্রামে হালিশহরে অবসর জীবনযাপন করছেন।

ভারতের বিহারের শাহাবাদে ১৯৫০-এ জন্ম। পিতার নাম আহমদ রাজা। ১৯৫০-এর দিকে এদেশে চলে আসেন। চট্টগ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন।

বাংলাদেশের প্রধান-প্রাচীন উর্দু সাময়িকী এখানে বেরোয়। চট্টগ্রামে দুটি মুশায়রায় অংশ নেওয়ার দুর্লভ সুযোগ এসেছিল আমার, তাঁর উপস্থিতি এবং কবিতা উপস্থাপনা প্রীতিকর।

আবদুল হামিদ সাকী

গজল

শান্তির নামে পাথর যদি আসে, আসুক না,
দুষ্কৃতকারী যদি পাথর ছুড়ে মারে, মারুক, মারতে দাও ॥
লক্ষ বার চেষ্টা করেও প্রাচীর তুলতে পারে না,
লোক যদি রাস্তায় পাথর বিছায়, বিছাক না ॥
ঘরবাড়ি, কাচের বা পাথরের, যারই হোক,
যারা থাকে তারা আমার আপনজন, পাথর মেরে আমি কার হৃদয় ভাঙি?
আমি কাচ, আমাকে কাচই থাকতে দিন,
আপনি যদি পাথর, আমাকে অন্তত পাথর বানাবেন না ॥
আমি ভাঙলে তোমাদের চেহারাও পাল্টাবে,
যারা পাথর ছোড়ে, তাদের বলো, আমাকে যেন পাথর না-দেখায় ॥
যারা মূর্তি ভাঙে, তারা কি পাথরে ভয় পায়?
যারা পাথরের পূজারি, তাদেরকেই পাথরের ভয় দেখাও ॥
যে-পাথর কেটে আমি মূর্তি বানালাম, সেই কি ঈশ্বর,
যে বানালো এই ভাস্কর্য, তাকে কেউ গ্রাহ্যই করছে না ॥
কী তামশা, আজব—ভাস্কর—বাস করে গরিবি হালে—
আর পাথরের কপালে ঢালে দুধ, তাকে রক্ত দিয়ে স্নান করায় ॥
সাকি, যে-দিন থেকে আমি কাচ-ভক্ত
সেদিন থেকেই চারদিক থেকে পাথর কেবল আমাকেই ডাকছে ॥

পরিচিতি : আবদুল হামিদ সাকী

সাকী তাঁর তাখাল্লুস, কবি-নাম, যাকে বলে পেন নেইম। আহমদ সাকীর জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৭, ভারতের উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার রাজাড়ে। তাঁর পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-কম পাশ করেছিলেন।

খুলনার একটি পাটকলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পারচেইজার হিসেবে। শামীম জামানভীর সম্পাদনায় হাতে লেখা সাময়িকী 'পারওয়াজ' (৭৪-৭৫) বেরোলে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। খালিলুর রহমান জখমীর সম্পাদনায় 'সংগমিল' সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রিত সাময়িকী। এই পত্রিকার সঙ্গে অনেকেই যুক্ত ছিলেন, হামিদ সাকী, এম. কে. আসান, শামীম জামানভী, আফতাব আহসার, জুলফিকার মুলতানপুরী (তিনিই আর্থিক দায় বহন করেছিলেন এই সাময়িকীর)-এদের সঙ্গে সাকীও যুক্ত ছিলেন। করাচী নিবাসী।

আবিদ জৈনপুরী

গজল

আমার কুশল জানতে হলে তাকে বাহানার আশ্রয় নিতে হয়,
আমার সামনে আসতে সে যে লজ্জা পায় ॥
তোমার নতুন সঙ্গীকে তুমিই চেনার চেষ্টা করো,
তা এক যুগ হবে, আমি তাকে চিনি ॥
দুনিয়া ভর আমার কথা রাষ্ট্র হতে থাকুক,
আমি চাই, অন্যের মুখে হলেও সে আমার কথাটি জানুক ॥
অচেনা লোকের সঙ্গে এতো যে মেলামেশা
সে তো কেবল আমার ওপর তার প্রভাব ফেলারই প্রয়াস ॥
কে কে তার পদতলে পিষ্ট হলো, এতে তার কিছুই যায় আসে না,
তার আগ্রহ আরও এ পা এগিয়ে যাওয়ার ॥
ভস্মের স্তূপ থেকে সে কেবল তুলে নিতে চায় নিজের পছন্দের জিনিস
আগুন লাগানোই তো তার নেশা ॥
আবিদ, আমি মনে করি, সে আমাকেই ভালোবাসে,
কিন্তু সে আমার গান এতো ঘৃণা করে কেন?

পরিচিতি : আবিদ জৈনপুরী

আবিদ জৈনপুরী ১৯৫০-এর দিকে এদেশে চলে আসেন, তাঁর জন্ম পশ্চিমবাংলার হাওড়ায়। জন্ম তারিখ, ডিসেম্বর ১৯২৮। তাঁদের আদি নিবাস ভারতের উত্তর প্রদেশের জৈনপুরে। ঢাকার মিরপুরে থাকেন। পেশা ব্যবসা।

আবিদ দানাপুরী

গজল

আশীর্বাদে বিলক্ষণ কিছু না কিছু ফল হয়,
কখনো-কখনো কেয়ামতও ফেরত পাঠায় ॥
ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, জুলুমের অভিযোগ,
বুকেই চেপে রাখি, আর সব দগ্ধ হতে থাকে ॥
পাগলামির ঘোরে পাহাড়-প্রান্তরের রূপ সম্ভোগ করি,
সুন্দরকে আবডালে সরায় যে বুদ্ধি তা দিয়ে কী লাভ হয়?
পথচারীর জোরে চলা সেতো চলার গতির আনন্দেই,
পদচিহ্ন অবধি মুছে যেতে থাকে ॥
কপালের আকর্ষণেও নয়, দরগার টানেও নয়,
হৃদয়ের প্রবল কম্পনেই কপাল ঝুঁকে ঝুঁকে থাকে ॥

পরিচিতি : আবিদ দানাপুরী

পাটনার দানাপুরে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মাবুদের জন্ম, আবিদ দানাপুরী হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন।

সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন। ১৯৪৭ সনে এদেশে চলে আসেন।

ওয়াহশাত্ কলকাতভীর শাগরেদ ছিলেন। মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ১৯৭২। আজিমপুর গোরস্থানে শায়িত।